হাই হ্যালোইন হায় ঈদ!

শওগাত আলী সাগর

ঈদ মোবারক। হ্যাপি হ্যালোইন! দুটো শব্দই শুনছিলাম অক্টোবরের শেষ ক'টা দিন ধরে। দুটোর কোনোটা নিয়েই উৎসাহের ঘাটতি নেই। মাঝে মধ্যে মনে হয়েছে, আসলেই কি দুটো নিয়ে সমান উৎসাহ? অতোটা ভাববার, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করার সুযোগ হয়নি। এই প্রবাসে বয়স্করা ঈদ নিয়ে বেশি ব্যস্ত, এটা বোঝা যায় ডেনফোর্থের বাঙালি দোকানগুলোর আয়োজন দেখে, ক্রেতাদের সমাগম দেখে। কিন্তু বাচ্চাদের কাছে, আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে কোনটা বেশি আকর্ষণীয়? ওরা কোনটি নিয়ে বেশি মেতে আছে, ঈদ নিয়ে? হ্যালোইন নিয়ে? নাকি দুটো নিয়েই?

হ্যালোইনের পোশাক কি হবে, কোন মুখোশটি কিনতে হবে এ নিয়ে ঘরে ঘরে বাচ্চাদের মধ্যে হৈ চৈ চলেছে প্রায় মাসখানেক ধরেই। আমি বাংলাদেশী কমিউনিটির কথাই বলছি। ঈদ নিয়ে সর্বতোভাবে একই রকমের উন্মাদনা হয়েছে সেটা বলা বোধ হয় একটু কঠিনই। অবশ্যই ব্যতিক্রম বাদে। কানাডায় যেহেতু থাকি, এখানকার সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করার সাধ্য কি? যদিও 'মাল্টি-কালচারালিজমে'র প্রবক্তারা আমাদের সংস্কৃতিকে কতোটা গুরুত্ব দেয়, আদৌ কোনো সম্মান দেখায় কি না সেগুলো প্রশ্নমুক্ত নয়। তা হলে কি একদিন প্রবাসে আমাদের ঈদ, প্রিয় ঈদ হারিয়ে যাবে মাল্টি-কালচারালিজমের ধাক্কায়? কি জানি?

গত ক'দিন ধরে গুন গুন করে আমি একটা কবিতার লাইন আউড়াচ্ছি। জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন,' হায় চিল, সোনালী ডানার চিল!' আমি ওটিকে সামান্য ঘুরিয়ে পড়ছি 'হায় ঈদ সোনালী স্মৃতির ঈদ।' হ্যাঁ, সোনালী স্মৃতির ঈদই তো বটে। জন্মভূমিতে প্রিয় স্বজনদের সঙ্গে, কিংবা ছোটোবেলা বা কৈশোরের সেই ঈদ কি আর ফিরে পাওয়া যাবে? কিংবা সেই ঈদ কি আমরা আর দেখবো আমাদের নতুন প্রজন্মের চর্চায়, আনুষ্ঠানিকতায়? এসবই ভাবনার

কথা, স্মৃতিতাড়িত মানুষের স্মৃতি রোমন্থনের কথা। বাস্তবতা বড়ই ভিন্ন।

প্রবাসে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েরা কতোটুকুই বা জানে কিংবা বোঝে ঈদ কতোটা দখল করে আছে আমাদের সংস্কৃতির। আমরাই বা কতোটা জানাতে পারছি তাদের। দল বেঁধে নতুন জামা পরে ঈদের জামাতে যাওয়া, নামাজ শেষে বুকে বুক মিলিয়ে কোলাকুলি, স্বজনদের জন্য অনুভূতির সবটুকু দরোজা খুলে দেওয়ার সেই সব মুহূর্তগুলো কোথায় পাবে এই দূর প্রবাসের নতুন প্রজন্ম।

সেদিন একজন সেরীনকে জিজ্ঞেস করেছিলো,

'ঈদে কি করবেন'?

ওর ঝটপট জবাব, কেন ক্লাসে যাবো। সেদিন তো ক্লাস আছে। তার বাইরে আছে দু' দুটো পরীক্ষা।

'সাগর ভাই কি করবেন?' পরের প্রশ্নটি আমাকে।

'সকালবেলা বেবি সিটিং, বিকেল বেলা কাজ।'

জবাবটা দিয়েই ভাবি, তা হলে ঈদ কোথায় আমাদের !

হ্যাঁ, প্রবাসে আমাদের ঈদ থাকে না, ঈদকে আমরা ঠিকমতো খুঁজে নিতে পারি না। উইক এন্ড ধরে ঈদ না এলে ঈদ উদ্‌যাপন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ওই দিনে সবার তো ছুটি মেলে না। টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি সকল ধর্মের প্রধান উৎসবের দিন তার ক্লাস বন্ধ রাখবেন। তিনি তো আর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখতে পারবেন না। তাই তিনি তার ক্লাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুসলমান ছাত্ররা ঈদের দিনে তার ক্লাস থেকে অন্তত ছুটি পাবেন।

উৎসবের আবেদন সব দেশে একই।

কানাডায় মুসলমানদের বসবাস কি একেবারে কম? কানাডার সরকারি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো মুসলমানদের মধ্যে বিন লাদেনের অনুসারী খোঁজার জন্যে যতোটা সক্রিয় তৎপরতা চালান, তাতে এদের সংখ্যাটা নিতান্ত কম কিছু বলে মনে হচ্ছে না। 'মাল্টি-কালচারালিজমের' প্রবক্তারা মুসলমানদের প্রধান উৎসবটিকে তাদের সংস্কৃতি উৎসবের সমান গুরুত্ব না দিন, অন্তত স্বীকৃতিটুকু যদি

দেন তাও কম কি? কিন্তু বাস্তবতা সত্যিই ভিন্ন।

এবার ঈদ হয়েছে শুক্রবার। এটি ছিলো বাড়তি পাওনা। শনি, রোববার যাদের কাজ থাকে না তারা একদিন ছুটি নিয়ে লং উইক এন্ড বানিয়ে ঈদ উদ্‌যাপন করেছেন। সবার পক্ষে সেটি সম্ভব হয়নি। একদিনের ছুটি মানে এক দিনের আয় কমে যাওয়া। অনেকে আবার ছুটি পাননি কিংবা ছুটি নেননি। তাদের জন্য ঈদ উদ্‌যাপনটা হয়েছে আসলে শনি ও রোববার। তবে বাঙালিপাড়া বলে খ্যাত ডেনফোর্থে বাঙালি মালিকানাধীন দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সবই বন্ধ ছিলো।

বায়তুল মোকাররম, মদিনা মসজিদ কিংবা আরো দূরে কোনো মসজিদে গিয়ে ঈদের নামাজ পড়েছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। বাংলাদেশে নারীদের পক্ষে বাড়ির বাইরে গিয়ে ঈদের নামাজ পড়া সুদূরের কল্পনা বৈকি! সেই বাঙালি মহিলাদের অনেকেই এখানে মসজিদে গিয়ে ঈদের নামাজ পড়েছেন। অবশ্য প্রায় সবক'টি মসজিদেই মহিলাদের জন্য নামাজের আলাদা ব্যবস্থা ছিলো। নামাজ ছেড়ে ঘরে এসেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন টেলিফোনের ওপর। দেশে স্বজনদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এটি আসলে শুরু হয় আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই। বাংলাদেশে তখন ঈদের দিনের সকাল। আর এখানে ঈদের দিনের সকাল মানে বাংলাদেশে ঈদের দিনের সন্ধ্যা। টেলিফোনের ডায়াল ঘুরাতে ঘুরাতে হাত ব্যথা হয়ে যায়,' অল সার্কিটস আর বিজি নাউ, প্লিজ ডায়াল লেটার' কম্পিউটার-কণ্ঠের এই বাণীর সঙ্গে পাল্লা দিয়েই চলে টেলিফোনের নাম্বার ঘোরানো।

এবার অবশ্য একটা বিশেষ সুবিধা করে দিয়েছে কানাডা সরকার । ৩১ অক্টোবর থেকেই ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে কানাডায় যখন রাত ১০টা বাংলাদেশে তখন সকাল ৯টা। মাত্র ক'দিন আগেও ঢাকায় সকাল ৯টায় কারো সঙ্গে কথা বলতে চাইলে এখানে রাত ১১টার জন্যে অপেক্ষা করতে হতো। কতো মজার ঘটনাই না ঘটে এসব উন্নত বিশ্বে। কিছু কিছু এলাকা বাদে কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ প্রদেশেই এপ্রিলের প্রথম রোববার ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা এগিয়ে দেওয়া হয়। আর অক্টোবরের শেষ রোববারে সেটি আবার এক ঘন্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এপ্রিলের প্রথম শনিবারেও যে সময়ে রাত ১২টা হয়, ঠিক তার পরদিনই রোববার সেই সময়টায়ই ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নিয়ে তাকে ১টা বাজিয়ে দেওয়া হয়। অক্টোবরে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়। কেন হয় এমনটি? সরকারি ব্যাখ্যা হচ্ছে, সূর্যালোক বেশি ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি

হ্যালোইন উৎসবের প্রতীক

সাশ্রয়ের এটি একটি উপায়। আসলে এই ব্যবস্থাটি চালু হয়েছে প্রথম জার্মানিতে ১৯১৫ সালে।'ডে লাইট টাইম' নামে জার্মানি একটি আইন পাস করার পর পরই ব্রিটেন, ইউরোপ এবং কানাডা সেটি অনুসরণ করে। জার্মানি এই আইনটি প্রবর্তনের কারণ হিসেবে ব্যাখ্যায় বলেছিলো, বসন্তের সকালে মানুষ যখন বিছানায় সুখনিদ্রায় কাতর থাকে কিংবা আলস্যে গড়াগড়ি খায়, ঠিক সেই সময়টাই সূর্যালোক প্রখর হয়ে ওঠে। লোকজন একটু সকাল সকাল বিছানা ছেড়ে উঠে গেলে সেই সময়টায় সূর্যালোক ব্যবহারের মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদন করা যায়, বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। কাজেই বসন্তে ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা এগিয়ে দিলে লোকজন এক ঘন্টা আগেই বিছানা ছাড়তে বাধ্য হবে। আবার শীতে যখন দিন ছোট হয়ে আসে তখন লোকজন অনেকটা অন্ধকার থাকতেই বিছানা ছেড়ে কাজকর্মের প্রস্তুতি নেয়। সেই সময়টায় ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা পিছিয়ে দিলে লোকজনও এক ঘন্টা পর ঘুম থেকে উঠবে। ফলে তেমন একটা বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না।

ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, ১৯১৫ সালে এই বিধানটি আইনি কাঠামো পেলেও এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা কিংবা উদ্যোগ ছিলো আরো অনেক আগ থেকেই। ফরাসি মন্ত্রী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ১৭৭০ সালে এমন একটি উদ্যোগ নিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে পারেননি। পরে ১৯০৭ সালে ইংলিশ লেখক উইলিয়ম উইলেট এই ধারণাটি পুনরায় প্রচার চালান । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অবশ্য আরেক ধরনের 'ডে লাইট টাইম' চালু হয়েছিলো ব্রিটেনে। সামারের সময় গড়ির কাঁটা দু ঘন্টা এগিয়ে দেওয়া হতো। আর শীতের সময় দেওয়া হতো এক ঘন্টা এগিয়ে। ১৯৬৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যে 'ডে লাইট টাইম' প্রবর্তন করে। অবশ্য ২০০৫ সালে এসে তারা নতুন আরেকটি আইন করেছে। নতুন আইন অনুসারে এপ্রিলের বদলে মার্চের প্রথম সপ্তাহেই গড়ির কাঁটা এক ঘন্টা এগিয়ে দেওয়া হবে। অক্টোবরের বদলে নবেম্বরের শেষ সপ্তাহে সেটি আবার এক ঘন্টা পিছিয়ে নেওয়া হবে। কানাডাও এই বিধানটি চালু করবে ২০০৭ সাল থেকে। যাই হোক, 'ডে লাইট টাইম'-এর বদৌলতে প্রবাসীরা বেশি রাত না জেগেই ঈদে স্বজনদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন, এটাই বা কম কি!

এই প্রবাসে বয়স্করা ঈদ নিয়ে বেশি ব্যস্ত, এটা বোঝা যায় ডেনফোর্থের বাঙালি দোকানগুলোর আয়োজন দেখে, ক্রেতাদের সমাগম দেখে। কিন্তু বাচ্চাদের কাছে, আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে কোনটা বেশি আকর্ষণীয়? ওরা কোনটি নিয়ে বেশি মেতে আছে, ঈদ নিয়ে? হ্যালোইন নিয়ে? নাকি দুটো নিয়েই

তবে আমার কৌতূহলী নজর ছিলো কানাডিয়ান মিডিয়ার দিকে। মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ বাৎসরিক এই উৎসবটি কানাডার মিডিয়ায় কিভাবে প্রতিফলিত হয় তা দেখার জন্য। না, টেলিভিশনের সংবাদে বিন্দুমাত্র উল্লেখ ছিলো না ঈদের কথা। টরন্টো স্টার, ন্যাশনাল পোস্ট কিংবা গ্লোব অ্যান্ড মেইল কোথাও না। টরন্টো স্টারে ঈদের দুটো খবর ছাপা হয়েছে। একটি হচ্ছে ইরাকের, অপরটি আফ্রিকার মোগাদিসুর। দুটো খবরে ঈদের সর্বজনীন আনন্দের কথা যতোটা না আছে, তার চেয়েও বেশি আছে ওই দুটি দেশের সন্ত্রাস আর রাজনীতির কথা। অথচ এই টরন্টো স্টারে দুর্গা পূজার খবর এমনকি দেওয়ালির খবরও অর্ধপাতা জুড়ে ছাপা হয়েছে। তা হলে মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যাপারে তাদের এতো কার্পণ্য কেন? মাল্টি-কালচারালিজম কি তা হলে মুসলমানদের সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে? হবে হয়তো! এসব কারণেই হয়তোবা আমাদের সন্তানেরা হ্যালোইন, ক্রিসমাস সম্পর্কে বেশি জেনে যায়। এগুলোকেও তারা তাদের সংস্কৃতি ভাবতে থাকে। সেজন্যেই বোধ হয় ঈদের চেয়েও ঘরে ঘরে হ্যালোইনের জয় জয়কার।

তবে ওইদিনই মজার একটি খবর ছাপা হয়েছে টরন্টো স্টার পত্রিকায়। ঈদের ঠিক আগের দিনই পুরো কানাডার প্রায় ৪ লাখ গ্রেড নাইনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো 'টেইক আওয়ার কিডস টু ওয়ার্ক ডে' নামের একটি কর্মসূচিতে। এই কর্মসূচির আওতায় নাইনথ্ গ্রেডের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়ে গিয়ে একদিনের জন্য ওই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হয়। ওই শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রায় ১০০ জনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো টরন্টো স্টার পত্রিকা অফিসে। দিনের গুরুত্বপূর্ণ সব নিউজ তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে বলা হয়েছিলো কোন নিউজগুলো কোন পাতায় যাবে তা ঠিক করতে। পত্রিকার মেকআপ ডিজাইন কি হবে তাও ঠিক করতে বলা হয়েছিলো। মজার ব্যাপার হচ্ছে, নাইনথ্ গ্রেডের শিক্ষার্থীরা তাদের বানানো ডামিতে 'ঈদ ডি. টাইম অফ জয়' শিরোনাম দিয়ে ঈদের খবরটিকে লিড হেডিংয়ের নিচেই বাম দিকের প্রথম নিউজ হিসেবে ট্রিটমেন্ট দিয়েছে। একটি খুনের মামলার খবরের চেয়েও এই খবরটি কেন অধিক মনোযোগ ও গুরুত্ব দাবি করে তা নিয়ে টরন্টো স্টার পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে বিতর্কও করেছে। শিক্ষার্থীদের তৎপরতার এই সংবাদটি টরন্টো স্টারেই ফলাও করে ছাপা হয়েছে। কিন্তু স্টার কর্তৃপক্ষ পরের দিনের পত্রিকায় আনন্দের ঈদ উৎসবের চেয়েও খুনের মামলার খবরটিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

কানাডায় খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বেশি। ক্রিসমাস এদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। হ্যালোইন হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব। আগে কেবল ছোট বাচ্চারা হ্যালোইনের উন্মাদনায় মেতে থাকলেও এখন বড়রাও এতে আক্রান্ত। মাসখানেক ধরেই লক্ষ্য করছিলাম বিভিন্ন এলাকায় বাড়িগুলোর আঙ্গিনা কেমন পাল্টে যাচ্ছে। পরিপাটি উঠো গুলো হঠাৎ করেই কেমন জানি ঘিঞ্জি হয়ে উঠছে। নানা রকম দৈত্য, দানব, জন্তু-জানোয়ারের প্রতিকৃতি বানিয়ে রাখা হয়েছে উঠোন জুড়ে। হ্যালোইনের জ্বর আর কি! মার্কেট শপিং মলগুলোতে এই জ্বর আরো বেশি। হ্যালোইন উপলক্ষে এ বছর ১.১ বিলিয়ন ডলারের কেনাকাটা হয়েছে বলে প্রাথমিক হিসেবে পাওয়া তথ্য থেকে জানা গেছে।

এই যে হ্যালোইন নিয়ে এতো মাতামাতি এর উদ্ভব হলো কিভাবে? নেপথ্য ইতিহাসই বা কি? সেও এক মজার কাহিনী। প্রায় ২ হাজার বছর আগে বর্তমানের আয়ারল্যান্ড, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলের কিছু এলাকায় বসবাসকারী সেল্টিকরা ১ নবেম্বরকে পালন করতো তাদের নববর্ষ হিসেবে। এই দিনটিকে তারা দেখতো সামারের পরিসমাপ্তি এবং হিম শীতের আগমনী দিন হিসেবে। সেই সময়টায় শীত মানেই ছিলো গহিন অন্ধকার, রোগ-ব্যাধি আর মৃত্যু। তারা বিশ্বাস করতো নতুন বছরের আগের রাতে অর্থাৎ ৩১ অক্টোবরের রাতে মৃতদের পৃথিবী আর জীবিতদের পৃথিবীর সীমান্ত উন্মুক্ত হয়ে একাকার হয়ে যায়। ফলে বহু আগে মৃত্যুবরণ করে ভূত হয়ে যাওয়া আত্মাগুলো ৩১ অক্টোবরের রাতে পৃথিবীতে ফিরে আসে তাদের ফেলে যাওয়া শরীরের খোঁজে। কিন্তু সেই শরীরে তো এখন নতুন আত্মা। নতুন মানুষ বসবাস করছে পৃথিবীতে। ফলে পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষগুলো আতঙ্কিত হয়ে ওঠে যাতে ভূতদের নজরে পড়ে তাদের প্রাণ হারাতে না হয়। তারা বিশ্বাস করতো ফেলে যাওয়া শরীরের সন্ধানে এসে এই সব ভূতরা ঘরবাড়ি, ফসলের ক্ষেত সম্পদ ইত্যাদির ক্ষতি সাধন করতো। আর এ থেকে পরিত্রাণ পেতে সেল্টিকরা ৩১ অক্টোবরের রাতে 'সামহাইন উৎসব' পালন করতো। এই রাতে প্রতিটি বাড়ির প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে একটি বিশালাকৃতির প্রদীপ প্রজ্বলিত করে পুরো গ্রামবাসী সেখানে সমবেত হতো। তারা পশু, জীব-জানোয়ারের আকৃতির পোশাক বানিয়ে সেগুলো পরিধান করে প্রদীপের সামনে বসে নিজেদের ভাগ্য নিয়ে আলাপচারিতায় মগ্ন হতো। ওই প্রদীপের আগুনে প্রাণী বিসর্জন দিতো ভূতের দৃষ্টি থেকে রেহাই পাওয়ার বাসনায়। উৎসব শেষে এই প্রদীপের আগুন নিয়ে তারা নিজ নিজ ঘরে বাতি জ্বালাতো। তাদের বিশ্বাস ছিলো এই বাতি পুরো শীতটা তাদের অশরীরীদের হাত রেখে বাঁচাবে।

রোমানরা সেল্টিক ভূখন্ডের দখল নেওয়ার পর এই উৎসব আচার আচরণেও পরিবর্তন ঘটে। পরে খ্রিস্টধর্ম বিকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে এরও বিস্তৃতি ঘটে। সাত শতকে পোপ বোনিফেইস পহেলা নবেম্বরকে 'অল সেইন্টস ডে' হিসেবে ঘোষণা দেন। এই দিনটিকে নির্ধারিত করা হয় সকল সাধু এবং শহীদদের শ্রদ্ধা জানাবার দিন হিসেবে। এই দিনটিকে 'অল হ্যালোস ডে' বা 'অল সেইন্টস ডে'ও বলা হতো। আর এর ঠিক পূর্ববর্তী রাতটিকে পালন করা হতো 'অল হ্যালোস ইভ' হিসেবে। এ থেকেই পরবর্তীতে হ্যালোইন নাম পায়। কালের পরিক্রমায় এটি একটি বাৎসরিক উৎসবে পরিণত হয়।

আমার কৌতূহলী নজর ছিলো কানাডিয়ান মিডিয়ার দিকে। মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ বাৎসরিক এই উৎসবটি কানাডার মিডিয়ায় কিভাবে প্রতিফলিত হয় তা দেখার জন্য। না, টেলিভিশনের সংবাদে বিন্দুমাত্র উল্লেখ ছিলো না ঈদের কথা। টরন্টো স্টার, ন্যাশনাল পোস্ট কিংবা গ্লোব অ্যান্ড মেইল কোথাও না। টরন্টো স্টারে ঈদের দুটো খবর ছাপা হয়েছে। একটি হচ্ছে ইরাকের, অপরটি আফ্রিকার মোগাদিসুর। দুটো খবরে ঈদের সর্বজনীন আনন্দের কথা যতোটা না আছে, তার চেয়েও বেশি আছে ওই দুটি দেশের সন্ত্রাস আর রাজনীতির কথা

এখনো কি ভূতের হাত থেকে বাঁচতেই এই হ্যালোইন উদ্‌যাপন। হ্যাঁ। কানাডা তথা উত্তর আমেরিকা জুড়ে মানুষগুলো এখনো হ্যালোইনের মূল তথ্যকে বিশ্বাস করেই এটি পালন করে। তবে তারা মনে করে অনিশ্চয়তা, অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা তথা অশরীরীদের নজর যাতে তাদের সমৃদ্ধির পথে বাধা না হয়ে দাঁড়াতে পারে সেজন্যেই হ্যালোইন এতো জনপ্রিয়তা পেয়েছে। পরিণত হয়েছে উৎসবে। এই হ্যালোইনে দৈত্য-দানবের পোশাক পরে অশরীরীদের ভয় দেখিয়ে, চকলেট খাবার বিলিয়ে অশরীরীদের সন্তুষ্ট করে নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে চায় কানাডীয়রা।

প্রতি বছর ৩১ অক্টোবরের জন্যে অপেক্ষার প্রহর গোনা শুরু হয় কয়েক মাস আগ থেকেই, প্রস্তুতিও শুরু হয় তেমনি আগ থেকেই। ৩১ অক্টোবরের বিকেল থেকেই ঢল নামে রাস্তায়, বয়স্করা ছোট বাচ্চাদের নিয়ে চলেন এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি, এ মহল্লা থেকে অন্য মহল্লা। বাচ্চারা নিজেদের সাজিয়ে নেয় ভীতিকর কোনো জন্তু-জানোয়ারের পোশাকে, কোনো বাড়ির সামনে গিয়ে হাঁক দেয়, প্যাকেটভর্তি ক্যান্ডি দিয়ে বিদায় করা হয় তাদের। ঘন্টার পর ঘন্টা ক্লান্তিহীন ঘুরে ঘুরে চকোলেট, ক্যান্ডি সংগ্রহ করে গভীর রাতে ঘরে ফিরে পরম প্রশান্তিতে ঘুমুতে যায় এসব বাচ্চারা।

আমাদের কাছে আজগুবি মনে হলেও কানাডিয়ানদের সংস্কৃতির অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ এই হ্যালোইন। অভিবাসী শিশুরা নিছক ফান হিসেবেই হোক, কিংবা ব্যাগ বোঝাই করে ক্যান্ডি সংগ্রহের অভিলাষেই হোক হ্যলোইনের মিছিলে শরিক হয়ে যাচ্ছে প্রতি বছর। আর এভাবেই এটি পেয়ে যাচ্ছে সর্বজনীন একটি চরিত্র। অন্য সংস্কৃতি থেকে আসা মানুষগুলো ক্রমশ নিজের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তা নিয়ে পীড়িত বোধ করেন না যতোটা না উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন হ্যালোইনের মতো উন্মাদনা সৃষ্টিকারী উৎসবগুলোর সঙ্গে একাত্ম হতে পেরে।